সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ১৭ই আষাঢ়, ১৩৯৪

উচ্চশিক্ষা : পরামর্শ ও সুপারিশের মিল কী কাকতালীয়

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট উপদেষ্টা কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন এবং আবাসিক হলগুলোর সীটভাড়া বাড়ানোর সুপারিশ করেছে।

ছাত্রবেতন ও সীটভাড়া বৃদ্ধির এই সুপারিশ কার্যকর হলে বেতন ৬৬ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ এবং সীটভাড়া ৬৬ শতাংশ থেকে ৮৭ শতাংশ বাড়বে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় কম বলেই বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী অর্থের উপর বেশী নির্ভরশীল থাকতে হয়। বাজেট উপদেষ্টা কমিটি মনে করে যে, সরকারের উপর অতিরিক্ত আর্থিক নির্ভরতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। স্বায়ত্তশাসনকে যুক্তিযুক্ত এবং আরও বাস্তব করার জন্যই নিজস্ব আয় বাড়ানো প্রয়োজন। কমিটি সুপারিশ প্রসঙ্গে এই অভিমত ব্যক্ত করেছে।

লক্ষ্য করার বিষয়, বিশ্ব ব্যাংকও সম্প্রতি এক রিপোর্টে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় ছাত্রদের বেতন ও অন্যান্য ফি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে। রিপোর্টে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় বেশী একথাও বিশ্ব-ব্যাংকের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এর কিছুটা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে উসুল করে সরকারী ব্যয় কমানোর পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাজেট উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ ও বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শের মধ্যে এই মিল কাকতালীয় বলে মনে হতে পারে।

এমন অনেক খাত আছে যেখানে সরকারী ব্যয় গত ১৫ বছরে বিশ গুণেরও বেশী বেড়েছে। বিশ্ব ব্যাংক তৎসম্পর্কে কিছু বলেনি।

আমাদের সরকার এবং শিক্ষামন্ত্রীও বলেন যে, বর্তমান সরকার শিক্ষাখাতে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছেন। টাকার অংকটা দেখিয়ে এই দাবী করাতে মনে হয়, এত বড় সত্য কথা আর কখনো শোনা যায়নি। কিন্তু যদি লক্ষ্য করে দেখা হয়, তাহলে চোখে পড়বে যে, ১৯৭২-৭৩ সালে বাজেটের শতকরা ২০ দশমিক ১ ভাগ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল। সেখানে নয়া অর্থবর্ষে শতকরা ১৬ ভাগ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৮৫ ভাগ বৈদেশিক সাহায্য থেকে প্রাপ্ত। সুতরাং আমাদের দেশের কোন কমিটি বা সংস্থার বক্তব্যের সাথে যদি বিশ্ব ব্যাংকের বক্তব্যের মিল থাকে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

হ্যাঁ, যুক্তি হিসেবে একথা উঠতে পারে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, গৃহাদি তথা ভবন নির্মাণের উপকরণের মূল্যের পটভূমিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবেতন ও সীটভাড়া একান্তভাবেই কম। তাহলে এটা বাড়ানোর বিরোধিতার পক্ষে যুক্তি কোথায়?

প্রথমতঃ সার্বজনীন শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ-এর ভাবধারা সমাজ সংক্রান্ত প্রাগ্রসর ধ্যান-ধারণার ফসল। শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাটা জাতিসংঘ সনদে মানবাধিকারের অংশ এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে উচিত এই লক্ষ্য বাস্তবে কার্যকর করার মত অর্থনৈতিক অবকাঠামো সৃষ্টি। উচ্চতর শিল্পখাতে ব্যয় দেশের জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির তাগিদের সাথে সরাসরি জড়িত। ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যয় বৃদ্ধির দরুন সমাজের দরিদ্রতর অংশগুলো উচ্চশিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে সমাজ জীবনে বৈষম্য বাড়বে ছাড়া কমবে না।

বিশ্বের শক্তিমান দেশগুলো অস্ত্রখাতে ক্রমাগত যে পরিমাণ ব্যয়-বরাদ্দ বাড়িয়ে চলছে তাতে ক্রমাগত শিক্ষা ও সামাজিক কল্যাণ-মূলক খাতে অর্থ ব্যয় কমে আসছে।

তাদের এই অস্ত্রসজ্জা ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরূপ প্রভাব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপর সরাসরি পড়ছে। সামরিক বাজেটে বিভক্ত বিশ্বে অবিশ্বাস ও হানাহানি বাড়ছে এবং এ জন্য তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোর অস্ত্রখাতে ব্যয় ৬০-এর দশকের চেয়ে বিশগুণ বেড়েছে।

বর্তমানে বিশ্বে অস্ত্রখাতে ব্যয় দাঁড়াবে বছরে এক লাখ কোটি ডলার। ১৯৮৩-৮৪ সালেও এই পরিমাণ ছিল ৫০ হাজার কোটি ডলার।

জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থার মঞ্চ থেকে বলা হয়েছে, অস্ত্র ব্যয় কমিয়েই শিক্ষা প্রভৃতি খাতে ব্যয় বাড়ানো সম্ভব। একটি পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন নির্মাণের ব্যয় দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের নিরক্ষরতা কমিয়ে আনা যায় উল্লেখযোগ্যভাবে।

এসব কথার প্রতিধ্বনি আমাদের দেশের সরকারী-বেসরকারী মঞ্চ থেকে শোনা যায়। বিশ্ব ব্যাঙ্ক তৎসম্পর্কে নিশ্চুপ থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ভাগ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে দাওয়াই প্রয়োগের পরামর্শ দিয়ে আসছে, তার ফলাফল ভাল হয়েছে, এমন দাবী তাদের রিপোর্টেও কখনো উল্লেখ করা হয়নি।

আভ্যন্তরীণ সম্পদ বাড়ানোর জন্য উৎপাদনশীল অর্থনীতি অনুসরণের পরিবর্তে করারোপ এবং শিক্ষা প্রভৃতির ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় সংকোচের উপর তারা জোর দিয়ে আসছে।

আমাদের দেশেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে দেশীয় কমিটিগুলোর সুপারিশ চলছে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। বিষয়টি মনে হয় সরকারেরই ভেবে দেখা দরকার।